বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ৩০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৯

রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির সামঞ্জস্য : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোস্তফা কামাল মুজেরী*

১। পটভূমি

বাজার অর্থনীতিতে রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি - উভয়ই নীতিনির্ধারকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দুই নীতির মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য তা অনেকাংশেই প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক নয়। বাজেটের আকার, বাজেট ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ এবং অর্থায়নের পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করে রাজস্বনীতি। আর মুদ্রানীতি কাজ করে মুদ্রা সরবরাহ, ঋণ ও সুদের হারের উপর এর প্রভাব এর ভিত্তিতে। তবে উভয় নীতিই মূলত সামগ্রিক চাহিদাকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেহেতু উভয় নীতি একই ব্যাপ্তিতে কাজ করে, তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদেরকে বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধারণা থেকে মুদ্রা ও রাজস্বনীতিকে দুটো নয়, বরং একটি হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, যা কিনা একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়— অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন। তবে এই দুই নীতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু 'পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া' আছে যেগুলো একেবারেই ভিন্নতর। যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং লেনদেনের ভারসাম্যের উপর এদের প্রভাব। মূলত এই স্বতন্ত্র পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণেই এই দুটো নীতির মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াজনিত পৃথক লক্ষ্য অর্জনে নিয়োগ করা হয়।

বাস্তবে যেহেতু রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতিকে গুরুত্বের সাথে একে অপরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেজন্য বিতর্কের একটি প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয় তাদের আপেক্ষিক ফলপ্রসূতা। বিগত বছরগুলোতে এই দুই নীতির আপেক্ষিক ক্ষমতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। মুদ্রানীতির পৃষ্ঠপোষক (monetarist) এবং রাজস্বনীতির পৃষ্ঠপোষক (fiscalist)— এই দুই গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নীতিদুটির স্বাতন্ত্র্যের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।[১]

২। রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির ধারণা

নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজস্বনীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়: রাজস্বনীতি হলো 'কোনো সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কর ব্যবস্থা, সরকারি ব্যয় এবং সরকারি ঋণ কার্যক্রমের ব্যবহার যা সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সম্পদের বণ্টন এবং স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত' (প্রেমচাঁদ ১৯৮৯)। এই সংজ্ঞা রাজস্বনীতির একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বহি:প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে কারণ এতে ঋণ ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যা মুদ্রানীতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।[২]

---

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

[১] বিশেণ্ডষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই দুই গ্রুপের মধ্যে নীতি সংক্রান্ত বেশিরভাগ পার্থক্যই নির্ভর করে মুদ্রানীতি কিভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে তার উপর। মুদ্রানীতির রাজস্বধারণা উদ্ভূত (কেইনসীয়) দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহ্যগতভাবে গুরুত্ব দেয় সুদের হার নিয়ন্ত্রণকে। অন্য দিকে মুদ্রা উদ্ভূত (monetarist) ধারণা অর্থের পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। রাজস্বনীতি না মুদ্রানীতি কোনটি বেশি শক্তিশালী এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে এই বিকল্প মানদন্ডের কোনটি ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর।

[২] এ প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদ (১৯৮৯) উলেণ্ডখ করেন, 'কোনো সরকারি কার্যক্রম তখনি পরিপূর্ণ রাজস্বনীতি হিসেবে বিবেচিত হবে যখন অর্থের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বেসরকারি খাতের উপর সরকারি ঋণের প্রভাব নিরপেক্ষ হবে। বাস্তবে পরিপূর্ণ রাজস্বনীতির ধারণা পাওয়া দুষ্কর কারণ রাজস্ব আয় ও ব্যয়ে যেকোনো পরিবর্তন বাজেট ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত অর্থায়নে পরিবর্তন আনয়ন করে যার ফলে তা মুদ্রানীতির সাথে জড়িত হয়। ঋণ ব্যবস্থাপনা, আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, ঋণ গ্রহণের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহের ব্যবহার, তাদের ইস্যুর সময় এবং তাদের স্থায়ীত্ব— এগুলো মুদ্রানীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত'।

এজন্য নীতি বিশেণ্ডষণের ক্ষেত্রে সরকারি ঋণ কার্যক্রম এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা এই দুটি বিষয় রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যকার যোগসূত্র বা পারস্পরিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুদ্রানীতিকে অনেকে একটা মোটা দাগের (blunt) হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেন যা অর্থনীতির সবগুলো খাতকে একইসঙ্গে প্রভাবিত করে; অবশ্য তা ভিন্নভাবে ও পরিবর্তনশীল প্রভাবের মাধ্যমে। অন্যদিকে রাজস্বনীতির পরিবর্তন কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে করা হয় যেমন, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য গড়-পরীক্ষিত (means tested) সুবিধা বাড়ানো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে করের হার কমানো, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনিয়োগ ভাতা প্রদান ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, জাতীয় আয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মুদ্রা অথবা রাজস্বনীতি যেকোনো একটি ব্যবহারের প্রভাব নিরূপণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি সুদের হার হ্রাস করবে যা ভোক্তা ও স্থির মূলধন ব্যয় উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটাবে এবং প্রকারান"ড়রে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হবে। কারণ বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মূলধন বৃদ্ধি পায় যা ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অপরদিকে সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতি (যেমন, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি) সরাসরি সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করবে। কিন্তু যদি এই ব্যয় বৃদ্ধির অর্থায়ন ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারি ঋণের মাধ্যমে করা হয়, সেক্ষেত্রে সুদের হার বৃদ্ধি পেতে পারে যার ফলে বিনিয়োগ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে নীট ফলাফল (সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে) হবে বর্তমান আয়ের বৃদ্ধি। কিন্তু যেহেতু বিনিয়োগ ব্যয় কম হতে পারে, সেক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ যতটুকু হতে পারত তার চেয়ে কম হবে, ফলস্বরূপ ভবিষ্যৎ আয়ও কম হতে পারে।

এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, যখন কোনো অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ড় হয়, সেরকম পরিস্থিতিতে জাতীয় আয় ও ব্যয় বৃদ্ধিতে মুদ্রানীতি সফল নাও হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে চাহিদাকে উদ্দীপিত করার জন্য রাজস্বনীতি বেশি সফল হতে পারে। অনেক অর্থনীতিবিদ আবার এ ব্যাপারে দ্বিমতও পোষণ করেন। তারা মনে করেন যে, মুদ্রানীতিতে স্বল্পকালীন পরিবর্তন ভোক্তা ও ব্যবসার আচরণকে বেশ দ্র"ত ও দৃঢ়তার সাথে প্রভাবিত করে। অপরদিকে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে সাধারণ 'Crowding out' অবস্থার সৃষ্টি করা ছাড়াও রাজস্বনীতি যথেষ্ট কার্যকর নাও হতে পারে। ভবিষ্যৎমুখী ভোগতত্ত্বগুলো থেকে এ প্রসঙ্গে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হচ্ছে ভোক্তারা নিজেদের আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকারি রাজস্বনীতিকে অকার্যকর করে দিতে পারে। যেমন, সরকারি ব্যয় ও ঋণ বাড়লে ভবিষ্যতে করের বোঝা বাড়ার আশঙ্কায় জনগণ ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি না করে বর্তমান সঞ্চয় বাড়িয়ে দিতে পারে।

রাজস্বনীতির কার্যকারীতা যাচাই এর ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হচ্ছে রাজস্বনীতি সম্প্রসারণমূলক, নাকি সঙ্কোচনমূলক তা স্থির করার প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে রাজস্ব ঘাটতিকে রাজস্ব সংক্রান্ড় অবস্থার (fiscal stance) নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, কারণ রাজস্ব ঘাটতি নিজেই পরনির্ভরশীল (endogenous)।[৩] নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশের রাজস্ব স্ট্যান্স নিয়ে একটি বিশেণ্ডষণে বিবেচিত ১৭ বছরের মধ্যে ১১ বছরই রাজস্বনীতিকে উৎপাদন ভারসাম্য বিনাশী (output destabilizing) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (পিএইউ ২০০৮)। দৃশ্যত, যেসব বছরে উৎপাদন সাধারণ ধারার নিচে ছিল, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ মুল্যস্ফীতির চাপ এবং/অথবা বৈদেশিক খাতের সমস্যার কারণে সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতি গ্রহণ করতে সম্ভবত অনিচ্ছুক ছিল। একইভাবে ১৭ বছরের মধ্যে ১৫ বছরই মূল্যস্ফীতির দৃষ্টিকোণ

[৩] রাজস্ব স্ট্যান্স পরিমাপের একটি সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি হলো প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি ও চক্রানুক্রমিকভাবে নিরপেক্ষ (cyclically neutral) রাজস্ব ঘাটতির মধ্যকার পার্থক্য ব্যবহার করা। রাজস্ব স্ট্যান্সে বছরক্রমিক পরিবর্তনই হলো রাজস্ব ইমপাল্স (fiscal impulse)। এই ক্ষেত্রে একটি সংকোচনমূলক রাজস্ব স্ট্যান্সে আরও হ্রাস বা একটি সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব স্ট্যান্সে আরও বৃদ্ধি উভয়েই একটি ধনাত্বক রাজস্ব ইমপাল্স পরিমাপ করে। রাজস্বনীতিকে যদি উৎপাদন ভারসাম্য আনয়নে সহায়ক করতে হয়, তাহলে উৎপাদন যখন সাধারণ ধারার নিচে থাকে তখন রাজস্ব ইমপাল্সকে ধনাত্বক হতে হবে এবং উৎপাদন যখন সাধারণ ধারার উপরে অবস্থান করে তখন তা ঋণাত্মক হতে হবে।

থেকে রাজস্বনীতি অস্থিতিশীল ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের রাজস্বনীতির প্রধান নিয়ামক হিসেবে উৎপাদন বা মূল্যস্ফীতি কোনোটিকেই ব্যবহার করা হয় না।

মুদ্রানীতির দিক থেকে, মূল লক্ষ্য এবং ফলাফলের মধ্যে বৈপরীত্য বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে বেশ দৃশ্যমান এবং অনেকটা অভ্রান্তভাবে নিয়মানুক্রমিক। ফলে এধরনের লক্ষ্য নির্ধারণের বিশ্বাসযোগ্যতা ও বাস্তবিকতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। নীতিনির্ধারণের প্রেক্ষিতে ঋণের প্রবৃদ্ধি সংযত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বাস্তবে তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় সরকারি খাতকে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশেই অকার্যকর।[৪] ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার দুটি প্রধান দেশজ উৎস থেকে ঋণ নেয়– ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস, যা আসে মূলত জাতীয় সঞ্চয় স্কীম থেকে। নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে এই দুটি উৎস পারস্পরিক সম্পর্কহীন (mutually exclusive) হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে কারণ আপেক্ষিক রিটার্নের হারের উপর নির্ভর করে ভোক্তারা তাদের সঞ্চয় হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা রাখে অথবা জাতীয় সঞ্চয় স্কীমে বিনিয়োগ করে।[৫] ফলে যে উৎস থেকেই ঋণ নেয়া হোক তা ভোক্তার সঞ্চিত অর্থ থেকেই যায়। এজন্য এটা বলা যায় যে, ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত উৎসের মধ্যে সরকারের দেশজ ঋণের বণ্টনে কোনো পরিবর্তন ব্যাংক ব্যবস্থার তারল্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বড় পার্থক্য সৃষ্টি নাও করতে পারে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণের কাঠামো। যদি সঞ্চয়ী ব্যাংক থেকে ঋণ না এসে প্রধানত বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আসে, তবে অর্থব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তিশালী মুদ্রা (high-powered money) সঞ্চারিত হবে যা তারল্যের বিস্তারকে অনেকটাই প্রভাবিত করবে।[৬]

কার্যকারিতার দ্রুততার ভিত্তিতে মুদ্রানীতি এবং রাজস্বনীতি কিন্তু একটি অন্যটির চেয়ে আলাদা। মুদ্রানীতিকে অধিকতর নমনীয় বলে বিবেচনা করা হয় এই কারণে যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রানীতির ভঙ্গি পরিবর্তন করা যায় অন্যদিকে রাজস্বনীতির পরিবর্তন (যেমন কর হারের পরিবর্তন) কার্যকর এবং বাস্তবায়ন করতে অধিকতর সময় লাগে। যেহেতু মূলধন বিনিয়োগ করতে হলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রয়োজন, সেহেতু সুদের হারের হ্রাসকে বর্ধিত বিনিয়োগ ব্যয়ে রূপান্তরিত করতেও বেশ সময় লাগতে পারে। অন্যদিকে বর্ধিত সরকারি ব্যয়ের প্রভাব তখনই অনুভূত হবে যখন তা ব্যয় করা হবে। আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হ্রাসের প্রভাব অর্থনীতিতে বেশ দ্রুত অনুভূত হতে পারে। অবশ্য একটি সরকারি ব্যয় কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত এবং এটি বাস্তবায়ন করার মধ্যে বেশ সময় লাগতে পারে।

ফলপ্রসূ "চাহিদা ব্যবস্থাপনা" - এর জন্য রাজস্বনীতি বা মুদ্রানীতি ব্যবহারের বেশ কিছু বিষয়ের প্রতি নীতিনির্ধারকদের লক্ষ রাখতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন নীতির মধ্যে

---

[৪] বেসরকারি খাতকে ঋণ দেয়ার প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১১ অর্থবছরে ১৬.৫ শতাংশ এবং ২০১২ অর্থবছরে ১৮ শতাংশ। কিন্তু প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২৫.৮ শতাংশ এবং ১৯.৭ শতাংশ। সরকারি খাতের জন্য প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১১ অর্থবছরে ২৫.৩ শতাংশ এবং ২০১২ অর্থবছরে ২৮.১ শতাংশ যেখানে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩৩.৬ শতাংশ এবং ১৮.৯ শতাংশ। একই রকমভাবে সংরক্ষিত মুদ্রার ক্ষেত্রে ২০১১ অর্থবছরে ১৫.২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২১ শতাংশ এবং ২০১২ অর্থবছরে ১৬ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ছিল ৯ শতাংশ (এমপিডি ২০১২)।

[৫] এই তথ্য থেকে এটি দৃশ্যমান হয় যে, ২০১০ অর্থবছরে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে সরকারি ঋণ লক্ষ্যমাত্রা বাজেটে ৩৮ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে বাস্তবে অর্জিত হয়েছিল ১২২.৬ বিলিয়ন টাকা যখন জাতীয় সঞ্চয় স্কীমের রিটার্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঞ্চয় হারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। কিন্তু ২০১১ অর্থবছরে যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেল, ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে নীট ঋণ ছিল মাত্র ৩০.১ বিলিয়ন টাকা। অপরদিকে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের নীট ঋণ ২০১০ অর্থবছরে ২০১১ অর্থবছরের ১৯৩.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ছিল -৪৩.৮ বিলিয়ন টাকা। এতে দেখা যায় যে, প্রকৃত দেশজ ঋণ ছিল ২০১০ অর্থবছরে ৭৮.৮ বিলিয়ন টাকা (বাজেটে ২০৫.৬ বিলিয়ন টাকা প্রাক্কলনের বিপরীতে)। অন্যদিকে ২০১১ অর্থবছরে প্রকৃত দেশজ ঋণ ছিল ২২৩.৯ বিলিয়ন টাকা, যা বাজেটে প্রাক্কলিত ছিল ২৩৬.৬ বিলিয়ন টাকা।

[৬] উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ২০১১ অর্থবছরে সরকারের নেয়া নীট ঋণ ১৯৩.৮ বিলিয়ন টাকার মধ্যে ৯৬.৪ বিলিয়ন টাকা এসেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে। এক্ষেত্রে মুদ্রা গুণক ৪ এর বেশি হওয়ার ফলে শক্তিশালী মুদ্রা এক ইউনিট বাড়লে বিস্তৃত মুদ্রা (broad money) বাড়ে চারগুণের বেশি। এরকম বিশদ মাত্রার বাজেট ঘাটতির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থায়ন মুদ্রানীতির কাঠামোর সাথে সুসঙ্গত নাও হতে পারে।

সম্ভাব্য ট্রেড-অফ (trade-off) বা সংঘাত নিরূপণ; নীতি নির্ধারণ ব্যবস্থায় সময়ক্ষেপণ (উদাহরণস্বরূপ, পরিমাপ, সিদ্ধান্ড় গ্রহণ, সম্পাদন এবং নীতি পরিবর্তনের কার্যকারিতা পরিবিক্ষণ); এবং সঠিক ধরনের রাজস্বনীতি নির্ধারণ। এছাড়াও রয়েছে রাজস্বনীতি সংক্রান্ড় ব্যয় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অন্য ব্যয়কে প্রভাবিত করবে কিনা তা যাচাই করা; রাজস্বনীতি বা মুদ্রানীতির পরিবর্তন অন্য অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধন করবে কিনা যেমন বিনিময় হার, বাণিজ্য ভারসাম্য এবং সরকারি সেবার প্রাপ্যতা ইত্যাদি। বিনিয়োগ যখন সুদের হারের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হয়, তখন রাজস্বনীতি সাধারণত দুর্বল হয়ে পড়ে; অন্যদিকে মুদ্রানীতি দুর্বল হয় যখন ভোক্তারা সুদের হার খুব কম হওয়া সত্ত্বেও অর্থ ব্যয় করার চাইতে অধিক পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে ইচ্ছুক হয়।

২.১। মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সামঞ্জস্য : বিশেণ্ডষণাত্মক কাঠামো

বাংলাদেশের মতো দেশে রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি উভয়ই স্পষ্টত সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয় উপাদান। উভয় নীতিই অন্যান্য নীতির মতো দেশের মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে, যেমন- সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি যুক্তিসঙ্গত মাত্রা রক্ষা, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন। এই সবগুলো লক্ষ্য সবসময় যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় থাকবে তা কিন্তু নয়। তাই নীতিনির্ধারকদের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো রাজস্ব ও মুদ্রানীতির যথাযথ সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা যেন সামষ্টিক নীতির প্রধান লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত না হয়।

রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সর্বোৎকৃষ্ট সমন্বয় প্রধানত বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে বিকল্প বৈদেশিক বিনিময় হারের প্রেক্ষাপটে। একটি ক্ষুদ্র দেশ, যেখানে মূলধন পুরোপরি গতিশীল এবং যেখানে অ-বাণিজ্যিক (non-traded) পণ্যের উপস্থিতি নেই, সেখানে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সর্বোৎকৃষ্ট মিশ্রণের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়। এমন একটি 'পাঠ্যপুস্ড়কে' বর্ণিত জগতে রাজস্বনীতি কার্যকর হবে যদি বিনিময় হার স্থির হয় এবং মুদ্রানীতি কার্যকর হবে যদি বিনিময় হার নমনীয় হয়। বাস্ড়ব জগতে অবশ্য নীতিনির্ধারকদের কাছে নীতি পছন্দের বিষয়টি এতটা সহজ নয়।

বাস্ড়বে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির স্বরূপ বিশেণ্ডষণ করা যায় সরকারি ঋণের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে রাজস্ব ঘাটতির অর্থায়নের বিকল্প পদ্ধতিগুলো বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে, যেমন-বন্ড অর্থায়ন এবং মুদ্রা অর্থায়ন (বৈদেশিক অর্থায়নের বিষয়টি বাদ দিয়ে)। বন্ড ইস্যু অথবা মুদ্রা সৃষ্টি যেকোনো একটি অথবা উভয়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে রাজস্ব ঘাটতি অর্থায়ন করা যায়। বন্ড ইস্যু অর্থ বাজারে সরকারি ঋণের সঞ্চালন ঘটায় (দেশজ অথবা বিদেশী বাজারে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই), মুদ্রা অর্থায়ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় নীট ঋণের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে আর্থিক ভিত্তিতে পরিবর্তন আনে। উপরন্তু রাজস্ব ঘাটতির এরূপ অর্থায়ন হতে পারে বাজার নির্ধারিত হারে অথবা সুবিধাজনক হারে, হতে পারে ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক, অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হলো, রাজস্ব ঘাটতি অর্থায়নের প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব কিছু সুনির্দিষ্ট ফলাফল রয়েছে যা মুদ্রানীতির ভঙ্গি (Stance) নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, দেশজ ঋণের উপর সরকারের নির্ভরতা বেসরকারি খাতের জন্য ঋণ প্রাপ্যতা, সুদের হার এবং আর্থিক ভিত্তির পরিবর্তন সাধন করতে পারে। অপরদিকে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরতা বহি:স্থ খাতের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্ড়ার করে। অনৈচ্ছিক অর্থায়ন বেসরকারি খাতে বিরূপ প্রভাব আনতে পারে। এ থেকে দেখা যায় যে, রাজস্ব ঘাটতি অর্থায়নের মাত্রা ছাড়াও রাজস্ব-মুদ্রানীতির সামঞ্জস্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার রাজস্ব ঘাটতির প্রত্যাশিত অর্থায়নের কাম্য সমন্বয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যা সামষ্টিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে। এটি বুঝতে হবে যে, সরকারি ঘাটতির অর্থায়ন ছাড়াও তারল্য সৃষ্টির অন্যান্য আরও পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন নীট বৈদেশিক সম্পদের সম্প্রসারণ, খোলা বাজার কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য আর্থিক হাতিয়ারের ব্যবহার।

২.২। বাংলাদেশে অর্থ ব্যবস্থাপনা

নব্বই দশক থেকে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন প্রচেষ্টার আওতায় মুদ্রানীতি কাঠামোর দৃশ্যমান পরিবর্তন হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে যা আরও কার্যকর মুদ্রা সঞ্চালন নিশ্চিত করার মাধ্যম সৃষ্টি করেছে। পূর্ববর্তী সময়ে আর্থিক খাতের বৈশিষ্ট্য ছিল খ িত, আর্থিক বাজার ছিল অনুন্নত এবং নীতি বাস্ড়বায়নের হাতিয়ার ছিল সংখ্যায় অপ্রতুল। সংস্কার প্রক্রিয়ার শুর ে থেকে কাঠামো ও হাতিয়ার উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে যা অর্থ ব্যবস্থাপনাকে বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। বাজার-বান্ধব মুদ্রানীতি সুচিন্ড়িতভাবে পরোক্ষ হাতিয়ারের ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, নব্বই দশকের পরবর্তী সময়ে মুদ্রানীতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুর ত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা মুদ্রানীতির প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নকে আরও বেশি স্বচ্ছ করেছে, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ হাতিয়ারের উপর নির্ভরশীলতা অনেক বেশি বৃদ্ধি করেছে এবং মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যকার বিনিময়ের অনুপস্থিতি আরও প্রত্যক্ষভাবে নীতিমালায় অন্ড়র্ভুক্ত করেছে।

এটি উলেণ্ঢখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি বাস্ড়বায়নের মাধ্যম হিসেবে রেপো, রিভার্স রেপো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিল হার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে যা প্রত্যাশিত মূল্যস্ফীতি অর্জন করার লক্ষ্যে আর্থিক ও প্রকৃত খাতের মূল্যকে প্রভাবিত করে। বার্ষিক আর্থিক কার্যক্রমে সংরক্ষিত মুদ্রাকে (reserve money) ব্যবহারিক টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং মধ্যবর্তী লক্ষ্য হিসেবে broad money বা বিস্তৃত মুদ্রা (M2) ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে যে অনুমিতিটি প্রয়োগ করা হয় তা হলো, দেশজ মূল্যস্ড়রের উপর আর্থিক সামগ্রিক চলক (যেমন M2) প্রবৃদ্ধির একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। তাই সামগ্রিক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্য স্থিতিশীল করার লক্ষ্য গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষিত মুদ্রার একটি হার নির্ধারণ করে যেটিকে লক্ষ্যকৃত মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। এটি মনে করা হয় যে, সংরক্ষিত মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বিস্তৃত মুদ্রার (M2) এমন একটা প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে যা লক্ষ্যকৃত মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত তারল্যের সাথে সুসঙ্গত। কিন্তু যদি সংরক্ষিত মুদ্রা ও M2-এর মধ্যকার সংযোগ দুর্বল হয় যা আর্থিক খাতের উন্নতি বা আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থিক সম্পদ প্রাপ্তির মাধ্যমে হতে পারে, তখন মুদ্রানীতির নতুন ধারা গ্রহণ করা প্রয়োজন হতে পারে।

স্বাধীনতার পর থেকেই মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং প্রবৃদ্ধি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতসমূহে পর্যাপ্ত ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা মুদ্রানীতির এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য বাংলাদেশে অপরিবর্তিত রয়েছে, যদিও পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন সময়ে তাদের আপেক্ষিক গুর ত্ব কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। অপরদিকে মুদ্রানীতির সঞ্চারণ পদ্ধতির কার্যকারিতার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনে অর্থ-বাজারের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত ছিল নিয়ন্ত্রণ ও আইনি পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার কাঠামোতে সুসামঞ্জস্য আনয়ন এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ড় অবকাঠামোর উন্নয়ন। অবশ্য সংস্কার কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে এখনও বলবৎ আছে। এখানে উলেণ্ঢখ্য যে, মুদ্রানীতির সঠিক কার্যকারিতার জন্য অর্থবাজারের সবগুলো প্রধান উপাদানগুলোর ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা গুর ত্বপূর্ণ। এর মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হলো: (ক) অর্থ বাজার, যা মুদ্রানীতির প্রধান মাধ্যম; (খ) ঋণ বাজার, যা অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতে সম্পদ প্রবাহের জন্য গুর ত্বপূর্ণ; (গ) মূলধন বাজার, যেটি দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের যোগানদাতা; (ঘ) সরকারি সিকিউরিটি বাজার (government security market), যা ঝুঁকিবিহীন বিশ্বাসযোগ্য আয় রেখা (credible yield curve) বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে গুর ত্বপূর্ণ; এবং (ঙ) বৈদেশিক মুদ্রা বাজার, যেটি বহি:খাত ব্যবস্থাপনার জন্য গুর ত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্ড়বতা হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন বাজারে সামঞ্জস্যহীন উন্নয়ন

সাধিত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় হচ্ছে এসব বাজারের সামগ্রিক এবং সংযোগপূর্ণ উন্নয়ন সাধন এবং একইসাথে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত জোরদারকরণ।

৩। বাংলাদেশে রাজস্ব ও অর্থখাতের মধ্যকার সংযোগ

রাজস্ব ও অর্থখাতের মধ্যে সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বেশ কিছু মাধ্যম (channel) কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারের ঋণগ্রহণ কর্মসূচি সরকার কর্তৃক ঋণ গ্যারান্টি প্রদান এবং আর্থিক খাতে সরকারি বিনিয়োগ। এগুলোর মধ্যে সরকারের ঋণ গ্রহণ কর্মসূচি অপেক্ষাকৃত বড়, মোট ও নীট উভয় দিক থেকেই। ব্যাংকিং খাত সরকারি সিকিউরিটির বেশিরভাগ অংশই ক্রয় করে। অধিকন্তু রাজস্ব-আর্থিক সংযোগ বিশেণ্ডষণে ঘাটতি অর্থায়নের সুযোগ এবং বন্ড অর্থায়নও বিবেচনা করা দরকার।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে 'রাজস্ব নিরপেক্ষতা'-র (fiscal neutrality) পরিবর্তে 'রাজস্ব অতি-কার্যকারিতা' (fiscal activism) বেশি পরিলক্ষিত হয় যার ফলে উদ্ভূত বৃহৎ সরকারি ঋণগ্রহণ কর্মসূচির কারণে রাজস্ব ঘাটতির অর্থায়ন অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ের সরকারি খাত চালিত উন্নয়ন পর্বে এই নীতি উন্নয়নের শক্তিশালী চক্র সৃষ্টি করার পরিবর্তে ঋণের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। কারণ এরূপ বিপুল ঋণগ্রহণের ফলে সৃষ্ট সম্পদ ছিল অপ্রতুল এবং তা প্রত্যাশিত ফলাফল দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে মূলত সহজ অর্থায়ন এবং ঋণের স্বল্প কারণে 'নমনীয় বাজেট সীমাবদ্ধতার' ('soft budget constraint') উদ্ভব হয়েছিল যা দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক-ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছিল। এধরনের বাজেট ব্যবস্থাপনা রাজস্ব বিচক্ষণতা নিশ্চিত করতে অক্ষম ছিল। ফলে বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব ঘাটতির দ্বারা মুদ্রানীতি সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এ থেকে বলা যায়, এ সময়ের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা অন্ড়তপক্ষে আংশিক হলেও রাজস্ব-আর্থিক খাতের সংযোগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

সংস্কার পরবর্তী যুগে অর্থনীতির ক্রমাগত উদারীকরণ এবং দেশজ আর্থিক বাজারের উন্নয়নের সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক একটি নতুন মোড় নেয়।[৭] নীতির লক্ষ্যের সুস্পষ্টতা এবং মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হাতিয়ারসমূহ ব্যবহারের অধিকতর স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম কাঠামোও বেশ পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশে রাজস্ব ও আর্থিক খাতের সংযোগ বিকশিত হওয়ার বেশ কিছু চিহ্ন এখন দৃশ্যমান। এর ফলে বৈদেশিক চাপ মোকাবেলা ও সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অর্থনীতি যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে। এসব ইতিবাচক উন্নতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংককে আর্থিক খাতের সার্বিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে সঠিক ভূমিকা পালন করতে প্রতিষ্ঠানটির অর্থপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার জন্য আরও প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।

নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কার্যকর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার জন্য তিনটি গুর"ত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। প্রথমত, রাজস্বনীতির ক্রমাগত প্রাধান্য, যার ফলে সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় এবং যা দূরীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনেক সময় অনৈচ্ছিক ঘাটতি অর্থায়ন করতে বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অ-আর্থিক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাধান্য, যার ফলে শুধুমাত্র সরকার এবং সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সরকারি খাতের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট থাকে না। তৃতীয়ত, মুদ্রা বাজারের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ব্যবস্থা যা মুদ্রানীতির কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ড় করে। বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশকে ফলপ্রসূভাবে 'উন্মুক্ত অর্থনীতি

[৭] নব্বই দশকে সূত্রপাত হওয়া সংস্কার কর্মসূচিতে বেশ কিছু কার্যক্রম অন্ড়র্ভুক্ত হয়েছিল যেগুলো রাজস্ব-মুদ্রানীতির সামঞ্জস্যহীনতা দূর করার সাথে জড়িত যেমন এডহক ট্রেজারি বিল ইস্যুর পদ্ধতি এবং স্বয়ংক্রিয় অর্থায়ন এর পরিবর্তে একটি বার্ষিক ও গ্রহণযোগ্য Ways and Means Advances (WMA) পদ্ধতি গ্রহণ করা যাতে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সাময়িক অসামঞ্জস্য দূর করা যায়, স্থিরকৃত সুদের হারের পরিবর্তে বাজারভিত্তিক সুদের হারের প্রবর্তন করা, নিবিড় রেপো কার্যক্রমসহ ব্যাংক হার ও মুক্তবাজার কার্যক্রম সক্রিয় করা; এবং পরোক্ষ হাতিয়ার ব্যবহারের উপর অধিকতর গুর"ত্ব প্রদান করা।

ত্রাইলেমা' ('open economy trilemma') মোকাবিলা করার সামর্থ্য অর্জন করা প্রয়োজন, যা উদার আন্তর্জাতিক মূলধন প্রবাহ, কার্যকর মুদ্রানীতি ও স্থিতিশীল বিনিময় হার-এই তিনের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন (trade-off)-এর মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্ট কারণেই রাজস্ব ক্ষমতায়ন প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত। যদিও বর্তমান রাজস্ব ঘাটতির মাত্রা বাংলাদেশের সহনশীলতার মধ্যেই রয়েছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু অপ্রত্যাশিত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বর্তমান রাজস্ব কার্যক্রমের প্রকৃতি যেকোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং প্রত্যাশিত মূল্যস্ফীতিকে সীমিত রাখার ক্ষেত্রে মুদ্রানীতির কার্যকারিতাকে অনেকাংশে সীমাবদ্ধ করেছে।

দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি উভয়ের সক্ষমতার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন। আর্থিক খাতের সামগ্রিক দক্ষতা ও স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যাংক-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর এককভাবে নির্ভর না করে বহুমাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামাজিক বাধ্যবাধকতা বণ্টন করা যুক্তিযুক্ত হবে। উপরন্তু মূল্যের স্থিতিশীলতাসহ মুদ্রানীতির অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলোর আরও দক্ষ অর্জন পরোক্ষভাবে হলেও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করবে। অন্যদিকে রাজস্বনীতিকে দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে আরও প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনকে আরও জোরদার করা সম্ভব। এভাবে বাংলাদেশের মুদ্রানীতির ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে এমন একটা অবস্থার সৃজনে যাকে ড্রেজ (Dreze) এবং সেন (Sen) 'প্রবৃদ্ধি সৃষ্ট নিরাপত্তা' (growth mediated security) বলে অভিহিত করেছেন, অন্যদিকে 'সহায়তা তাড়িত নিরাপত্তা' (support led security) এর মতো প্রত্যক্ষ দারিদ্র্য বিমোচন পদক্ষেপ অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে অর্জন করা সম্ভব রাজস্বনীতি ও অন্যান্য সরকারি কার্যক্রমের মাধ্যমে ।

৪। উপসংহার

বাংলাদেশে রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে Ways and Means Advances এবং অন্যান্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক কাঠামো গঠন প্রচেষ্টা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মুদ্রানীতির জন্য কার্যকর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে তথা দীর্ঘমেয়াদি মূল্য স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক খাতের সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বাড়াতে, আরও দ্রুত মাত্রার টেকসই এবং উন্নতমানের, সামগ্রিক আর্থিক সমন্বয়ের অধিকতর ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। মুদ্রানীতির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বাড়ানো, আর্থিক বাজারের বিভিন্ন খাতের পরস্পরযুক্ত বিকাশসাধন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা ও প্রকৃত অর্থনীতির কার্যকারিতা বৃদ্ধি সাধনের উদ্যোগকে সমর্থন প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে দক্ষ আর্থিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ঋণ বাজারের বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত অবকাঠামো খাতের অর্থায়নে যাতে ঋণ বাজার সহায়ক হতে পারে সেদিকে নজর দেয়া দরকার। ঋণ বাজারের এরূপ বিকাশের জন্য পূর্বশর্ত হলো সরকারি সিকিউরিটির জন্য একটি দ্রুত বিকাশমান বাজার যা সুদের হারের জন্য বেঞ্চমার্ক প্রদান করে। এটি মুদ্রানীতির সমন্বিত সঞ্চালনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকর রাজস্ব-আর্থিক সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব নিয়মানুবর্তিতার সুরক্ষা প্রয়োজন, যা বস্তুত রাজনৈতিক-অর্থনীতির গতিশীলতার একটি বহিঃপ্রকাশ। রাজস্ব নিয়মানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা হবে এটা নিশ্চিত করা যে, রাজস্ব ঘাটতি অর্থায়নের পদ্ধতি হবে এমন যা সামষ্টিক অর্থনীতির গতিশীলতার

পথে সবচেয়ে কম বিঘ্নকারী এবং যা দ্রুত প্রবৃদ্ধির অনুকূল। এটি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, বাস্ড়ব আর্থিক পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনহীন মুদ্রানীতি পরিচালনা খুব একটা কার্যকর হতে পারে না।

এটিও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, রাজস্ব ঘাটতির কোনো আদর্শ মাত্রা নেই এবং এই সংক্রান্ড় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: রাজস্ব ঘাটতি কীভাবে অর্থায়ন করা হচ্ছে এবং ব্যয়কৃত অর্থ কিসের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে? এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ঋণের আকার নির্ধারণ করে রাজস্বনীতি; আর সরকারি ঋণ মুদ্রানীতির সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে। অপরদিকে ঋণের গঠন নির্ধারিত হয় ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতির দ্বারা। ঋণের আর্থিক প্রভাব নির্ভর করে কে ঋণ বহন করছে, নীতি পরিবর্তনের সাথে এটি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সামগ্রিক চাহিদার উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব কিরূপ— এসব বিষয়ের উপর।

বাংলাদেশের মতো দেশে রাজস্ব ও মুদ্রানীতি সমন্বয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট সামাজিক চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। এর জন্য শুধু চাহিদা ও যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্যই নয়, বরং এর সাথে চাহিদা ও যোগান কাঠামোর মধ্যেও ভারসাম্য অর্জন প্রয়োজন। অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং উভয়ের কাঠামো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির কার্যকর সমন্বয়ের শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে। সাধারণভাবে মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হচ্ছে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামগ্রিক ভারসাম্য সুরক্ষা; অন্যদিকে রাজস্বনীতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উভয়ের কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় সাধন যাতে দুই নীতি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। এই দুটি নীতির সমন্বয় উন্নয়নের অনুকূলে হওয়া উচিত যা শুধুমাত্র দ্রুত উৎপাদন প্রবৃদ্ধি দ্বারা পরিমাপ করা যৌক্তিক হবে না বরং এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়নে সফলতা।

সামঞ্জস্যের জটিল প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে সমন্বয়ের কতগুলো মাত্রা রয়েছে। সমষ্টিগত পর্যায়ে ইস্যুটি হলো একটি নির্দিষ্ট রাজস্ব-মুদ্রানীতির সমন্বয় (উদাহরণস্বরূপ, রাজস্ব ঘাটতির মাত্রা, অর্থায়নের প্রকার, আর্থিকীকরণের (monetization) বিস্তৃতি ইত্যাদি বিষয়) বিদ্যমান সমষ্টিক লক্ষ্যের সাথে সুসঙ্গত কিনা। একইভাবে এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যেন রাজস্ব ও আর্থিক কর্তৃপক্ষের কর্মপদ্ধতি (উদাহরণস্বরূপ, ঋণ ও নগদ ব্যবস্থাপনা) সুসঙ্গত ও পারস্পরিক শক্তি সঞ্চারক হয়।

রাজস্ব ও মুদ্রানীতি উভয়েরই পরস্পরকে সমর্থন দেয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাদের আপেক্ষিক স্বাধীনতা রক্ষা করাটাও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তাদের ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে। সাধারণভাবে মুদ্রানীতির সমন্বয় সাধনে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে রাজস্বনীতির সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময় সাপেক্ষ। এ কারণে উভয় নীতির সমন্বয় সাধনের সাধারণ লক্ষ্য হওয়া উচিত অর্থনীতির স্বাস্থ্য ও নির্দিষ্ট সামষ্টিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে উভয় নীতির সুবিধাগুলো পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি এবং তা বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করা যাতে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

MPD (2012): *Major Economic Indicators: Monthly Update*, September 2012, Monetary Policy Department, Bangladesh Bank, Dhaka.

PAU (2008): *Monetary Policy Review*, Vol. 3, No. 2, Policy Analysis Unit, Bangladesh Bank.

Premchand, A. (1989): *Government Budgeting and Expenditure Controls: Theory and Practice*, International Monetary Fund, Washington D.C.